পুরোনো কবিতা, তাতে কবেকার আলো

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

এখন থেকে প্রায় ৮৫ বছর আগের 'প্রবাসী'তে ছাপা 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুকে আংশিক পড়ছি :

... আমি যদি কবি হ'তাম, তাহলে একটা বিশেষ ধরনের কবিতা লিখে যেতাম — তার নাম হ'ত Unpoetic Poetry। বাংলা প্রেমের কবিতায় দেখি, ফুল, কোকিল, পূর্ণিমা, প্রভৃতি ছাড়া Atmosphere হয় না। কিন্তু কেন হবে না? আমি হ'লে আমাদের বর্তমান জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাগুলিকে কবিতায় ঢোকাতাম। ... যেসব জিনিস সাধারণ লোকে unpoetic বলে ধরে রেখেছে, তার মধ্যেও যে কতখানি poetry আছে, তা কবে আমাদের চোখে পড়বে? আমাদের ঘরোয়া জীবনের শাড়ি, চিরুনি, ... আমাদের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ, ঝগড়া-ঝাঁটি, স্নেহ-বিদ্বেষ কবে আমাদের কবিতাকে রূপ দেবে? ... '

কতকাল আগে কবির সে খেদ মিটেছে অবশ্যই। বাংলা কবিতায় সেই ঘরোয়া জীবনের অল্প থেকে উপচে পড়া বেশি অবধি কত রূপে তার উপস্থিতি —। তার জন্য 'খেদ মিটেছে' কথাটি স্থায়ী মীমাংসার কাছে সুস্থিত থাকবে কি!

তখনই সময়ের মলিনতা (ধুলো?) মুছে — পুরোনো কবিতা, পুরোনো কবি-সঙ্গের জন্য আমার অভিপ্রায়ের কাছে একটি নির্জন উচ্ছ্বাস থাকেই। মুহুর্মুহু রূপবদলের কবিতায় পরিচিত কত বস্তু কত সত্য হারিয়ে যাচ্ছে। এখন লুকোনো পূর্ণিমার জন্য একটা অন্বেষণ যদি থাকে, পুরোনো ছবির জন্য একটা ডাক যদি থাকে — সে তো এক ব্যক্তিক অনুভব, আমার অনুযাতও। পাশ্চাত্য থেকে বাংলা কবিতার নব্য কাঠামোর জন্য কত কত কল্লোল। কৃত্তিবাস, হাংরি ইত্যাদি আন্দোলনের কারণে বস্তুবাদ বা বিষয়বাদ থেকে কবিতার আবহমান ধারাকে কি বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে? বিষয় থেকে বিষয়হীনতা, কবিতায় জায়মানতা, নির্মাণ-বিনির্মাণের পথে ভারচুয়াল পোয়েট্রির ভাঙনের পর এলিমেন্টারি অবজারভেশন — তা পার হয়ে শূন্য দশকের কবিতা, কত কী ...! আনন্দ, যন্ত্রণা, সৌন্দর্যবোধ — এ পুরোনো ছেড়ে নতুনে পৌঁছানোর স্বরূপটা কী? তবে কি পুরোনোকে ভাঙা, অস্বীকার করাই হল নতুন কবিতার জন্ম! এখনও যে পঙ্‌ক্তি উচ্চারণে শুধু পুলক — 'ফুলের মতো সহজ হয়ে আসে/ তোমায় কিছু বলার মতো ভাষা' তা জায়মানতার যেদিকেই থাক, তাতে হওয়ার দুঃখ, না হওয়ার দুঃখ, সবুজ দেখার আনন্দ, চাঁদ দেখার আনন্দতে বিভ্রমের স্থান বা উপলক্ষ কোথায়? পুরোনো শেকড়ের আড়ালে আলো-আঁধারিতে সব কবিতাই তখন নতুন কবিতা —

দু-একটা অদ্ভুত রাস্তা থাকে
দু-একটা ফাঁকা বহির্ভূত রাস্তা
দু-একজন ধু ধু করা লোক থাকে সেই রাস্তায়

যারা ফেরে না ...

তার পাশেই পুরোনো পথটি এসে দাঁড়ায়। তার পাশ দিয়ে আজও গোধূলি রঙের পাখিদের উড়ে যাওয়া। যদি চোখ মেলি সেদিকেই —।

প্রায় ৫৮ বছর আগে প্রকাশিত বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাব্যগ্রন্থ 'একুশটা মেয়ে'র ভূমিকাটুকু পড়ছি :

... একটা ফোঁটা উর্বশী, আর অর্ধফোঁটা তিলোত্তমা।
একটু শকুন্তলার গুঁড়ো, একটু নয়নবারি জমা —
একটু ছেঁড়া কাঁচলি আর একটা ছটাক মিষ্টি হাসি,
গহন রাতের ছাতে শোনা অনেক দিনের আগের বাঁশি
জ্যোৎস্না দিয়ে সে সব বাটা, তাইতে গড়া কুহকিনী
কুহকিনী, চিনি, চিনি ...

অন্তরায় এসে 'চিনি' শব্দটি কবিতা চেনার সঙ্গে কীভাবে, কতটা যুক্ত করবে — আগ্রহ ও প্রশ্ন সেখানেই।

পাওয়া, না-পাওয়ার শর্তে চকিতেই মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' — শতবর্ষের আগে লেখা কবিতা থেকে স্ফুট সহজ চিত্র : রাশি রাশি ধান কাটা হল সারা হোল। ক্ষুরধারা, খরপরশ নদী পাশে, ধান কাটতে কাটতে কখন এল বর্ষা। ভয়ংকর নদীতে কৃষকটি সহসা একটি তরী দেখতে পেল। তার আবেদন — 'বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।' সেই তরী কৃষকের 'সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' তার ফিরে যাবার যায়গা রইল না। মুহূর্তে কৃষকের ভাবনা : 'শূন্য নদীর তীরে/ রহিনু পড়ি — যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।' তখন সুতপা ভট্টাচার্যের আলোচনায় একটি লক্ষ্যস্থল দেখতে পেয়েছিলাম — 'শূন্যই এই কবিতার একমাত্র যুক্তাক্ষর, যা কবিতাটির প্রায় শেষে যেন 'হঠাৎ কোন ধাতব শব্দের' মতো বেজে উঠেছে।

এই কবিতাটি নিয়ে কিছু অমীমাংসিত তর্ক আছে। হয়তো পদ্মার বোটে কবির ভ্রাম্যমাণ সময়ের প্রত্যক্ষ ছবি। আতঙ্কিত কৃষকটির পাশে নির্ভীক নাবিকটি কে? সে ওই দুর্যোগে গান গাইছিল পর্যন্ত। সে কোথা থেকে এলো — কোথায় তার মূল গন্তব্য? সে কি তবে মহাকালের দূত? তা নিয়ে একগুচ্ছ তর্ক। নাবিক তো সাধারণত পুরুষ — এমন ভাবনাই প্রচলিত। বিশেষ করে এমন দুর্যোগ ও ভয়ংকর নদীতে নৌকো ভাসিয়ে গান গাইবে যে নাবিক সে নারী হবে — ভাবনাটি দুরূহ। মজা হল, রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন এ কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন — তখন নাবিকটি কিন্তু নারী। ফলে কবিতাটি ঘিরে স্বাভাবিক রহস্যময়তা। কবিতার অন্তর্গত রহস্যময়তার বাইরের অধিক এই রহস্যময়তা, কবির কাছে অধিক পাওনা বলে যদি অনুভব করি — তবে!

কতদিন বাদে আবার তারাপদ রায়-কে পড়তে গিয়ে দেখি কবিতার পরিপাটি সাজানো গোছানো ঘর-বারান্দা কেমন অগোছালো করে দেন কবি। আসলে অগোছালো শেষপর্যন্ত কবিতার এক গোছালো-পর্ব গড়ে দেবার ম্যাজিক — কবি তারাপদ'র কবিতা ছাড়া আর কোথায়? তাড়াতাড়ি একটা কবিতার কাছে যাই —

'আমরা একদিন খুব বড়লোক হবো'/ আমার নিতান্ত ছেলে কথায় কথায়,
কোনো দিন/ বলে ফেলে/ কোনোদিন এইরকম আমিও ভেবেছি।
... / ফ্রিজ, গাড়ি, হাত-পা ছড়ানো ফ্ল্যাট?

পরক্ষণেই কবি তারাপদ আত্মগত — 'আসলে আমিও এক রেলালাইন পেরুনো ভিখিরি, ল্যাম্প-পোস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে বহু কষ্টে শহরে পৌঁছেছি।' সেখান থেকে 'কার্পেট ও দামি পর্দা, ঝকমকে ড্রয়িং-রুম, ঠোঁটে আলতো লিপস্টিক মসৃণ মহিলা' পর্যন্ত গিয়ে কবি থমকে দাঁড়ান। তখন 'নিতান্ত ছেলে' এই শব্দটি ছাড়াতে পারিনি — ছেলেকে রেখে সরে গিয়েও নিতান্ত শব্দটি বাকি অনেক বিষয়বস্তুকে উড়ে উড়ে গিয়ে স্পর্শ করে। কবিতা পড়া শেষ — শব্দ ভাবনা ম্যাজিক জালে জড়ায় যে!

এই তো দেখছি সেই কবিতা — শূন্য/ শূন্যতা-শব্দের নির্মিতি বুঝি। একটা সহজ প্রকরণের পথ দ্রুত ছড়িয়ে পৌঁছে যায় অনুভবের কোষে।

যে যার কার্নিশ, জানলা বাড়ির নক্‌শায়/ যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত আছে, / যে যার শূন্যতা/ নিজেই রচনা করছে, ...

তখন বাড়ি উঠছে শূন্যে, এক এক দিন পাতা ঝরে — কার্নিশ, জানালা শূন্যতায় ভরে, যায়। 'নীল শূন্য থেকে ক্রমাগত ঝরাপাতা/ শূন্যতা রচনা করছে, যে যার জীবনে।' শূন্যতাকে অস্বীকার করার সাধ্য কী! কবি তারাপদ দেখতে পান কার্নিশ, জানালার নক্‌শায় শূন্যতার উপস্থিতি, এক এক দিন তার পূর্ণতর রূপ, ঝরাপাতার নির্মিত শূন্যতার কাছেই শেষপর্যন্ত 'যে যার জীবন।' শূন্য শব্দটির যুক্তাক্ষর ভেঙে নিঃশব্দে আমাদের বেঁচে থাকার একটা মর্মস্থলে গিয়ে হাজির হয়। নীল শূন্য থেকে শুধু পাতা, ক্রমাগত ঝরা পাতা,পার হওয়া জীবন থেকে আরও পার হওয়া জীবনের দিগন্ত পথ যেন। 'জানলা' শব্দটি আর কবিতার বিষয় থাকে না — জীবনের তলদেশ হয়ে ওঠে। যে যার জীবন দেখার এক আশ্চর্য জাদুপথ তারাপদ'র কবিতার সামনে এসে দাঁড়ায়।

আর একবার, আর একটু কবি তারাপদ পড়ি : নদীর ভিতর থেকে উঠে এসে গ্রাম/ নদীর ভিতরে ডুবে যায়। ১০ লাইনের কবিতার মাঝের স্পেসে — শতাব্দীকাল তার ছায়া, জন্ম-মৃত্যু, সানাই, শিশুর হামা — কাদামাটি মাখা, ছুটে আসা হাওয়ার কলাপাতা ছেঁড়া — ছোটো ছোটো ছবি, তাতে আপাত তেমন আলো নেই। কিন্তু শেষ লাইনে এসে থমকে যাই — নদীর ভিতরে গ্রাম, গ্রামের ভিতরে নদী।' তখন আমাদের ভাঙাগড়া জীবনের বেঁচে থাকা আর টিঁকে থাকার আখ্যানটুকুর কাছে কবি তারাপদর ওই লাইনটি আত্মস্থ হয়ে পড়ে। 'নদী' আর 'গ্রাম' শব্দ দুটি বিস্ময়ের মধ্যে চলাচল করে। সেখান থেকে চিরকালের অনিশ্চিত জীবনের পুরাণকে কবি তারাপদ দ্যাখেন বড়ো নিরিবিলি। নিজে অনেকটা বাইরে থেকে পাঠককে নিবিষ্ট করে দেন গভীরতায় — কবির এক ধরনের কৌতুক যেন।

'স্তব্ধ দুপুর'-এ কবির সঙ্গে সামান্য থাকি। কবির সাপ্তাহিক সূচিতে ছ'দিন অফিস, সাতদিন বাজার, একদিন রেশন, একদিন ডাক্তার, মাঝে দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্র তার ধারাবাহিক পাঠ শেষে তার 'হাতে ছিলো তিন সেন্টিমিটার অবসর।' অবসরটুকুতে তখন স্তব্ধ দুপুর। সেই অবসরে তার কাছে :

আমগাছের নীচে একটা সাদা ভেড়া/ যার কোঁকড়ানো লোম কোনো কম্বলের জন্যে
কোনোদিন দরকার পড়েনি,
কয়েকটি শুকনো পাতা ধীরেসুস্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠময়,
কচুরি পানার ফুল এমন রঙিন কে আগে জানতো?

এত সামান্য বিষয় কবিতার কাছে বিস্ময়ে ঘনীভূত হয়ে আসে আর কবি তখন আমাদের পুনরায় নীল দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেন। এক ম্যাজিক থেকে আর এক ম্যাজিকের দিকে গন্তব্য তখন। একবার কবি বাসুদা— (প্রয়াত কবি বাসুদেব দেব) কবি তারাপদকে চেনাবেন বলে তাঁর দুটি লাইন শুনিয়েছিলেন :

শ্রীমতী নিসর্গসুন্দরী দেবীর সঙ্গে শেষবার দেখা হলো।
রানাঘাট শহর পেরিয়ে চূর্ণি নদীর উত্তর পাড়ে। ... তিন
মিনিটের রামধনু সৃষ্টির ম্যাজিক দেখিয়ে তিনি বৃষ্টিতে মিলিয়ে
গেলেন।'

নিসর্গের এই তারাপদ-সুলভ বর্ণনা মনে রাখার মতো। খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে গতানুগতিকতা ভেঙে সৃষ্টি করেছিলেন এক বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা। সেখান থেকে ক্রমশ এক আত্মজিজ্ঞাসা কবি তারাপদ'র গভীরে বাসা বেঁধেছিল। সেই পরিচিত কবিতার চরণ আর একবার শুনি :

কোনোদিন দেখা হয় না
কোনোদিন কারও সঙ্গে দেখা হয় না।
... এ কেমন মাঠের মত শান্ত, অসহায়
যেন নীল ঘাসের গালিচায়
নৌকা না আরাম কেদারা?
কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু

কবি তারাপদকে পড়লে পাঠককেও এক আত্মজিজ্ঞাসায় আছন্ন হতে হয় বুঝি।

'যত দূর চোখ যায় যত দূর মন,/ তত দূর আনন্দ করে বিচরণ।' যত দূরের পুরোনো মনটাকে দিয়েই আবার এ সময়েই কবি অজিত দত্তকে ভাবতেই, কবিকণ্ঠ : ..., 'হে পৃথিবী, কোনো এক জানালার কাছে, / মনে রেখো, একজন পরিচিত আছে।।' আর দ্বিধা রইল কই! কবি অজিত দত্ত মানেই তো সেই 'কুসুমের মাস'। পরিচিত সেই পাতাটি খুলি আবার —

তুমি ফুল ভালোবাসো? লাল ফুল? চোখে যাহা লাগে?
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত?
তুমি ভালোবাসো ফুল? শেফালিকা সৌরভ-আনত?
যে ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে?

এতগুলি জিজ্ঞাসার পর একটি আত্মস্বর জেগে ওঠে, তাতে একটা সময় ও আগ্রহ যেন, ছটফট করে, অংশত ঝলমলও। 'আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।' সময়কে চিহ্নিত করার এমন বর্ণ অনেকবার কবি অজিত-এর কলমে দেখি। বাকি কথাটুকুতেও শব্দের চলন আসে সে গোত্র মিলিয়ে — কুসুম-বিতান/ নিভৃত কুঞ্জ/ মধু-অবকাশ/ তন্দ্রাস্তব্ধ — তাতে কি একান্ত অবস্থান, অন্তহীন নিরালা যেখানে বুঝি নিশ্বাসের শব্দও অতিরিক্ত হয়ে পড়বে। এমনকি কুণ্ঠিতা অতসীর কোমল মুকুলে এসে অনির্ভার হয়ে ওঠে জীবনের মধু-অবকাশ। ততক্ষণে কবি এই সৌন্দর্যের কাছে মুহ্য। ততক্ষণে বলতে শুনেছি : 'মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।' এই কুসুমিত অবকাশ অবধি তোলপাড় হৃদয়ে বাইরে যাবার চঞ্চলতা বেজে উঠেছে, তখনও শঙ্কা — : তোমার চোখের 'পরে আঁধার করিবে ছলছল/ এভাবে, কতবার মনে হবে, কবি অজিত-এর সুন্দর দেখা বুঝি সুন্দর শেষ হয় না। 'কাল রাত্রে একলা আঁধার পথে শহরতলীতে/ দেখলুম অদ্ভুত মেয়ে এক।' তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না ফোটেনি, আকাশের ময়লা আলোতে তার উড়ন্ত হালকা চুল, 'পাপড়ির মতো তার

চোখের পলক নত, আবছা', 'ওড়নার মতো মুখখানি অর্ধেক ঢাকা, তবুও 'দেখছি পলক তার' পর্যন্ত কবির দৃষ্টি পৌঁছে যায়। কবিতার মজাটুকু শেষ অংশে শুনছি :

কালকে আব্‌ছা রাতে দেখছি যে অদ্ভুত শহরতলীতে/ .../ যদিও ছিল না
হাওয়া, যদিও ওঠেনি চাঁদ কাল/ যদিও দেখিনি তার মুখ।।

তখন বুঝি সুন্দরকে দেখার রহস্যে কবি জড়িয়ে ফেলেন নিজেকে — আমাদের মতো পাঠককেও। ততদিনে কবি নিজের কাছে ফিরে এসে বসেছেন। শুনছি :

হে পৃথিবী, কোনো এক জানালার কাছে
মনে রেখো, একজন পুরাতন পরিচিত আছে।

জানালার কথাতেই 'পুরাতন পরিচিত' কবি অজিত দত্তকে দেখি। তাঁর 'কাঠের সীমানা আঁটা' জানালার কাছে 'একখণ্ড বিশ্বরূপ', উঁকি দিয়ে যায় 'আকাশের খণ্ডনীল গুটিকয় তারা', কখন এসে পৌঁছায় 'সোনালী রৌদ্র প্লাবনের মতন ...' সবকিছু ছাপিয়ে 'হে সুন্দর টুকু এ জানালা ডিঙিয়েই তাঁর ইন্দ্রিয়ের কাছে। ব্যক্তিগত অনুভবের তাৎপর্যে জানালা হয়ে উঠতো কবির নিরূপম আশ্রয়স্থল।

এমন আত্মগত কবিকে বুঝি অনিবার্য স্বস্তিহীন জিজ্ঞাসায় পড়তেই হয় : 'আজ ভাবি জীবনেরে হয়তো বা দেখেছি কখনো', 'হয়তো' শব্দটির দ্বিধাজড়িত অবস্থান থেকে সরেও আসেন দ্রুত — তবুও যে 'প্রশ্ন' তাকে ব্যাকুল করে —

: বৈকালের অস্পষ্ট ছায়ায়
নিরুত্তর প্রশ্ন জাগে — আয়ুতে কি জীবন ফুরায়?

এ জিজ্ঞাসার সামনে মরমি কবিকে বুঝি দাঁড়াতেই হয় — নিস্তার নেই।

'কুসুমের মাস' এর পরেও কুসুমের মাস-ই থাকে — মাঝে কুসুমিত অবকাশ। আর সেখানেই কবি অজিত দত্ত, তাঁর নিজস্ব জানালায় চোখ মেলে, একা।

কবি অশোকবিজয় রাহা 'ভানুমতীর মাঠ'-এর কোনো কবিতার (একটি সন্ধ্যা) দুটি লাইন পড়ছি :

মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি — আরে!
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!

ধ্বনিস্পন্দনের মাত্রাবৃত্তের উচ্ছ্বাস কখনও কি মনে হবে না যে রোমান্টিকতার উপস্থাপনে এক ধরনের মিথ প্রকাশই যা একজন কবিকে স্মরণযোগ্য করার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু সরলতাকে কলমে ভরে কবিতা লিখলেন বলে সময়ের বাংলা কবিতায় তাঁকে নিয়ে অনুচ্ছ্বাস।

'ভানুমতীর মাঠ'-এর একটি আস্ত কবিতাকে চিত্রকল্পের প্রত্যক্ষ অনুসরণে magic realism-এর জায়গা থেকে পড়তে ইচ্ছে করছে।

এক-যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর

বিষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয় জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায়-বা সেই ভালুক গেল, কোথায়-বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হ'ত কী যে
ভেবে পাই নে নিজে
সকাল হলো যেই
একটিও মাছ নেই
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর। (মায়াতরু)

প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে পড়ছে : 'কথাকে তার জড়-ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ।' বাংলা কবিতার ধ্বনিরূপের মধ্যে লৌকিক আনন্দের চলনটিই তো ছড়ার ছন্দ। আর, সে আনন্দেরই তো স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তি — গান। বাংলার প্রকৃতি এভাবেই নিঃশব্দে এসে কবি অশোকবিজয়ের কবিতায় বেজে উঠলো — তা যেন প্রকৃতির এক অমলিন স্বরূপ। কবির নির্বাচিত শব্দগুলি নিরন্তর যেন ছবির দিকে হেঁটে যায়।

কেউ কি বললেন — এটি (কবিতাটি) একটি ইমপ্রেশনিস্টিক পাঠ? — অবশ্যই। অশোকবিজয় নিজেই তো একবার বললেন : 'ভাব অর্থাৎ ইমোশনের দৃশ্যমান সিম্বল তৈরি করতে গিয়ে আমি এক সময় পাশাপাশি সাজিয়ে দিই কতগুলো ছবির তাস, এই পথটি খুঁজে নেবার সঙ্গে প্রকৃতির সঞ্জীবিত সত্তার সঙ্গে অন্তরের যোগ। ধ্বনি সৌন্দর্যের সম্পর্কে অশোকবিজয়ের চিত্রকল্পে প্রাণের স্বরূপ জেগে ওঠে — একেবারে ইমেজারির মতো।

•

গাছটি নিয়েই তো কবিতাটি, অথচ গাছটি ছাড়া কবিতার আর সব কিছু রয়েছে সামঞ্জস্যে যেন জাদুকরের মতো একটা কৃত্রিম আড়ালে দাঁড়িয়ে, আমাদের গাছটি দেখিয়ে দেন বা খুঁজে দেন। 'গাছ' ছাড়া এখন বোঝার কিছুই নেই; অন্য পরিচয়ও নেই তা বোঝার শুরুর মুহূর্তে আমরা যখন টানটান — জাদু শুরু তখনই। আলো-আঁধারে গাছটির রূপান্তরপর্ব শুরু। সন্ধেয় যাকে ভূতের নাচ জুড়তে দেখেছি, মেঘ আর বিদ্যুৎ ছটায় সে-ই ভালুক হয়ে উঠছে। বৃষ্টি শেষে চাঁদের আলোয় সেই গাছটি হয়ে উঠছে 'লক্ষ হীরার মাছ'। আবার ভোরবেলাকার আবছায়াতে গাছ-ই আবার হয়ে উঠছে 'ঝিকিমিকি আলোর রূপোলি এক ঝালর'। কবিতাটিতে 'মতো' বা 'যেন'-র প্রকৃতির তুলনাবাচক শব্দ নেই। উপমা নেই। তাতে অকারণ উপমার অপ্রয়োজন এড়িয়ে গাছটি, গাছই থাকে। একটি শিশুর চোখের ভয়, বিস্ময় ও আনন্দ-কল্পনার জায়গাগুলি কি সহজে স্পর্শ করে কবিতাটি।

ইমপ্রেশনিজমের প্রধান লক্ষ্যই তো ছিল যে কাছের পৃথিবীতে জড় ও জঙ্গমকে যেভাবে দেখা যায়, পারিপার্শ্বিক রং ও আলোর প্রতিক্রিয়ায় তাকে সেভাবেই ফুটিয়ে তোলা। তাতে অনেক বিষয়ই যেন আলো।। আলো বাতাসের ঘনত্বের তারতম্যে গাছটির ক্রমিক পরিবর্তনে হয়ে উঠছে কবিতা। এক সহজ আনন্দের পাশে বর্ণোচ্ছটার এক জাদুমুহূর্ত আমাদের মোহিত

করে।

এই কবি, অশোকবিজয় রাহা একবার চিঠিতে লিখলেন : এক একবার ভেবেছি আমি 'রিয়ালিস্ট', কখনও মনে হয়েছে আমি 'ক্লাসিসিস্ট', আবার অনেক সময় মনে হয়েছে আমি কড়াপাকের 'সিম্বলিস্ট' তবে কি আইডেন্টিটি ক্রাইসিস! তবে কি কবিতায় নতুন পথে যাবার উদ্যোগী ছিলেন রবীন্দ্র-অনুসারী মানুষটি! সে কারণেই কি ঘরছাড়া মানুষের প্রার্থনা

সদর রাস্তার পথটা কোথায়, দাও বলে ভাই,
আমি কেবল বেরোতে চাই —
বেরোতে চাই (সৃষ্টিছাড়া)

তখনও এক সৃজনশীল, দূরে চলমান এক রূপের দিকে গভীর আগ্রহে, তৃষ্ণায় অপলক থাকেন কবি অশোকবিজয় রাহা। বাড়ি থেকে, গার্হস্থ্য থেকে সংশ্লেষণের জাল কেটে প্রকৃতির সংশ্লেষণেই শেষপর্যন্ত তাঁর স্থিতি।

একজন কবিকে পড়তে এসে একথা দিয়েই শুরু করলে কি হয়? 'মৃত্যুর পরেই যে সম্ভাবনাময় জীবনের অভাবনীয় বিলুপ্তি আমাদের বিস্মিত করে তিনি কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য।' তাঁর বিপুল রচনাসম্ভার (৩৭টি উপন্যাস, ১০টি কাব্যগ্রন্থ, ৭টি প্রবন্ধ-গ্রন্থ, ৩টি নাটক ও ৩টি কিশোর গ্রন্থ) নিয়েই দ্রুত হারিয়ে যাওয়া এক বিস্ময়। তাঁকে নিয়ে একটুকরো আলোচনা শুনি : তাঁর জীবন যেন বিধাতার একটি খেয়ালি অপচয়, অবসানেই যা সর্বস্বান্ত ...।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য-এর একটি কবিতার পাঠের কাছে থাকি। 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' — তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা অবশ্য। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন'-এ তাঁর চারটি কবিতার মধ্যে 'নীলিমাকে'ও সংকলিত করেছিলেন।

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর
অন্ধকারের সাগর —
তুমি তাতে স্নান করে এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরির মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেপে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না;
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ;
বলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে নীলিমা;
নীল পাখির পালকের মতো?

জানি, তুমি আমায় ডাকবে —
(নীল বন কি কথা কয়ে উঠল —
আর মেঘের গায়ে গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা?)
আমার চোখ নরম হয়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা;
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

তিনটে স্তবকের কবিতা। অন্ধকারের গভীরে রাত জাগা যে সাগর তাতে নীলিমাকে স্নান করার নির্দেশ দিচ্ছেন কবি। তাতে নীলিমার চোখ নীল থেকে আরও নীল, চুল হয়ে উঠছে 'ধূসর ফুলের মঞ্জরির মতো।' ধূসর শব্দটির নান্দনিকতা প্রথম স্তবকের সঙ্গী হবার সাপেক্ষে যদি পাঠককে ভাবায় — । ধূসরতার তাৎক্ষণিক রূপটি এক্ষেত্রে অপরিহার্য বর্ণ পেলো কি? নাকি তার অন্তরাল — তট সংলগ্ন বালুকণার বর্ণের প্রতিভাস? না কি তাকে ছাড়িয়ে জলের গভীর তলদেশে নিঃসঙ্গ বালুরাশির, আকাশের কামনার প্রতিরূপ ধূসর বর্ণে এসে মঞ্জরিত হয়ে পড়লো! কবি, এ ভাবনা দায়টুকু যেন পাঠকের চিন্তার কাছে ন্যস্ত করেই পরের স্তবকে ফিরে যান — তরঙ্গে, প্রবাহে।

দ্বিতীয় স্তবকে 'আর যদি' শব্দ দুটি অনিশ্চয়তার চিহ্নে থাকে। কিন্তু সে-অনিশ্চয়তা-লক্ষণ ভেঙে চাঁদ ওঠে, নীলিমার আঁচলে ততক্ষণে ভিজে জ্যোৎস্না। তবে কি জ্যোৎস্না ও সমুদ্র অবগাহনে ছিল! চাঁদ ও জ্যোৎস্নার সমূহ রূপটিকে শেষপর্যন্ত 'তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ' একটি ইন্দ্রিয়সচেতন (জীবনানন্দীয়) অনুভব যেন কল্পনা ও রোমান্টিকতাকে ছাড়িয়ে এক আর্তি অবধি কবিতার চলনকে নিয়ে যায়। তারপরও বর্ণ উচ্ছ্বাসে কী এক দ্বিধা — জ্যোৎস্নার রং কি নীল হবে — নীল পাখির পালকের মতো! নীল পাখি সম্ভবত নীলকণ্ঠ পাখিই। যদি ভাবি ... 'জানি' বলে শেষ স্তবকে এক আশ্বস্ত অনুভব ছুঁয়ে সুরভিত জ্যোৎস্না ডাক দেয় বুঝি কবিকে। কবির চোখে তখন ঘুমঘোর — কাছে স্বপ্নে পাওয়া নীলিমা। আমরা দেখি, বন্ধনীর মধ্যে — নীল বর্ণ কী কথা কয়ে উঠল, আর 'মেঘের গায়ে গায়ে নেমে এল স্বপ্নরা। এভাবে মূর্ত আর বিমূর্ত, ঘুম আর স্বপ্নের পাশাপাশি সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র কবিতা প্রশস্ত হয় — আবছায়া নীল ছেড়ে, আরও নীলে।

ভাবনার কাছে তখনও কুতূহল যেন ফণার মতো — নীলিমা কে? আমরা তো বিনয় মজুমদারের গায়ত্রীর কথা জানি, জীবনানন্দ'র বনলতা সেন, বিষ্ণু দে-র ক্রেসিডা, বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতীকে। নীলিমাকে নিয়ে ভাবনাটুকু থেকেই যায় — থেকেই গেল আপাতত।

কবি সঞ্জয়ের কবিতায় রূপময়তার তেমন প্রাত্যহিক চিত্রধর্মিতা কই — অথচ উপস্থাপনার সৌকর্যে ইমেজের বিভা। বড়ো নীরবে বুদ্ধিবাদী মননে নিটসে, লরেন্স, এলিয়টে উদ্বুদ্ধ হওয়া কবি সঞ্জয়, শেষপর্যন্ত কবিতার এক গহনতার চর্চায় মগ্ন রইলেন। শেষপর্যন্ত প্রেম-বিরহ দিয়ে যে যাত্রাপথ তাকে শুদ্ধতম কবিতার অভিমুখে, সংকেতদীপ্ত বোধের অন্বয়ে কবিকে বৃহতের সাধনায় উন্মুখ করেছে। সাগর থেকে জ্যোস্নার দিকে যাওয়া তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনের প্রবাহ।

এভাবে, কবেকার পুরোনো যত্নের কবিতাগ্রন্থ একা একা ধুলো ঝেড়ে পড়া। সেখানেও পাওয়ার আনন্দ, সে বুঝি একার। তবু উচ্ছ্বাস প্রকাশের জড়তা কাটাতে গিয়ে কবিতাতেই একান্ত নির্ভর। তখনও উচ্চারণ শুনছি :

কবিতার সুবিধে আছে, উত্তরণ জানে, আমি তাই
কবিতা সম্বল করে পার হয়ে যাই।

সহযোগী পাঠ : কবি সুজিত সরকার